রূপদক্ষ যামিনী রায়

পার্থ গোস্বামী

গ্রন্থতীর্থ

৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা — ৭০০ ০৭৩

।। ভূমিকা ।।

কেউ কখনও ভাবেনি রবীন্দ্রনাথ তাঁর পঁয়ষট্টি বছরের উপান্তে পৌঁছে তাঁর পূর্ব পরিচয়কে সরিয়ে রেখে একজন চিত্রকর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। প্রস্রবণের মুক্তধারার মতো তাঁর অনতিপরিসর চিত্রকর জীবনে তিনি প্রায় দু-হাজার ছবি এঁকেছিলেন। ১৯৩০-এ তিনি দু-তিন বছরের আঁকা ছবি নিয়ে ইওরোপ ও আমেরিকা সফরে যান। লন্ডন, বার্মিংহাম, প্যারিস, বার্লিন, ড্রেসডেন, মিউনিখ, কোপেনহেগেন, মস্কো, বস্টন ও নিউইয়র্কে তাঁর চিত্রকলার প্রদর্শনী হয়। নিজের শক্তিকে আরেকবার যাচাই- এর জন্য তাঁর পাশ্চাত্যে যাওয়া। (কবি মনে করতেন তাঁর গান তাঁর দেশের জন্য, বিদেশের জন্য রইল ছবি)। রবীন্দ্রনাথ পুত্রবধূ প্রতীমাদেবীকে লিখলেন, 'ছবি আমি কোনো দিন আঁকিনি, আঁকব বলে স্বপ্নেও বিশ্বাস করিনি। হঠাৎ বছর দুই তিনের মধ্যে হু হু করে এঁকে ফেললুম আর এখানকার ওস্তাদরা বাহবা দিলে। বিক্রিও যে হবে তাতে সন্দেহ নেই। এর মানে কি? জীবনগ্রন্থের সব অধ্যায় যখন শেষ হয়ে এল তখন অভূতপূর্ব উপায়ে আমার জীবনদেবতা এর পরিশিষ্ট রচনার উপকরণ জুগিয়ে দিলেন।' কম বয়সে রবীন্দ্রনাথ আঁকার চেষ্টা করলেও বেশি বয়সের পাণ্ডুলিপি কাটাকুটিতে তা সদর্থক হয়ে ওঠে। তারপর ঘন জোরালো আর ওজনদার পেলিক্যান কালির দৌলতে কবি আদিম চিত্রকলায় মাতলেন কোনরকম পূর্ব

প্রস্তুতি ছাড়াই। তিনি কোনো গুবর কাছে নাড়া বাঁধেননি। ছবির স্থায়িত্বের কথা না ভেবেই অনেকসময় হাতের কাছে তুলি কলম না পেলেও আলখাল্লার প্রান্ত রঙে ডুবিয়ে ছবি এঁকেছেন। বিদেশে তাঁর ছবির কদর হলেও তাঁর নিজের দেশে তখনও রবি ব্রাত্য। দেশের মানুষ মনে ভাবে এ হল কবির বুড়ো বয়সের খেয়াল। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার বিশ্লেষকের ভূমিকায় দেখা গেল শিল্পী যামিনী রায়কে। সমস্ত রকম অবরোধ ও ভুল ব্যাখ্যার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন নবীন চিত্রকরকে, 'রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো বিস্ময় তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা, রং-এর কথা, সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই : অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। ..... রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনার পাহারায় অনভিজ্ঞতা কাছ ঘেঁষতে পারেনি। ..... রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপবোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরনের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি অ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার

কোনো ছবিতে অ্যানাটমি-বোধ যদি সত্যই থাকে তাহলে শুধু এই ধরনের ছবিতেই আছে। কারণ ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য কতটুকু? এ-শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশি আর কী? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য শিল্পেই কি এই সতেজ ভাব সবচেয়ে বর্তমান নয়? রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি তখন মনে হয় না সেটা এখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হাওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশো বছর ধরে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে-অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান; ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। ....চোখে-না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব, রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে।'

'রবীন্দ্রনাথের ছবি' নামক প্রবন্ধে যামিনী রায়ের এই বক্তব্য আশি বছরের রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিল অনাবিল আনন্দ ও অপরিমেয় তৃপ্তি। কেননা কবির মনে হয়েছিল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক বিশেষ ধারার বিশিষ্ট শিল্পী যামিনী রায়ের মতামতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, যদিও বয়সের দিক থেকে

তিনি রবীন্দ্রনাথেব থেকে ছাব্বিশ বছরের ছোটো (রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ আর যামিনী রায়ের ১৮৮৭)। উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪১ এর ২৫ মে তাঁর দেহাবসানের প্রায় আড়াই মাস আগে শিল্পী যামিনী রায়কে তাঁর অকুণ্ঠ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ জানিয়ে গেলেন—"কল্যাণীয়েষু, এখনো আমি শয্যাতলশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড়ো আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের কারণ এই যে, আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই। আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কিছু দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিস্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমার কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধকরি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না। আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাদের দোষ দিইনে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচার-শক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন।

সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না, এইজন্য তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি—শুভার্থী রবীন্দ্রনাথ"

রবীন্দ্রনাথের শুভকামনা যামিনী রায়কে তাঁর চিত্রকলার জগতে আরো অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। তাঁর নিজের জীবদ্দশায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিত্রকলা সম্পর্কে দ্বিতীয় কোন খ্যাতিমান ভারতীয় শিল্পীর কাছ থেকে এতখানি স্পষ্ট ভাষায় ইতিবাচক সমর্থন এর আগে পাননি। তবে নতুন ধারার শিল্পী হতে যামিনী রায়ের বেশ কিছুদিন সময় লেগেছিল। কলকাতায় সরকারি আর্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার (১৮৫৪) প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে যামিনী রায় কলকাতায় এসেছিলেন আর্ট স্কুলে ছবি আঁকা শিখতে। ইওরোপীয় ধরণ ও স্বদেশী ঘরানার বিষয়গুলি যত্ন সহকারে আত্মস্থ করে যামিনী রায় সরে এলেন নিজের পথে। নিজস্ব পথ খুঁজে নেওয়া খুব সহজ আর অনায়াস ছিল না সেইসময়। কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের কৃতী ছাত্র ছিলেন। প্রতিকৃতী শিল্পী হিসেবে যামিনী রায় তখন একটা নাম। তবুও সহজ প্রতিষ্ঠার পথ ছেড়ে একান্ত নিজের মতো করে একটা পথ খোঁজার তাড়নায় তখন তিনি অস্থির। ভারতীয় শিল্পকলার যে-সব ধারার মধ্যে দিয়ে তাঁর একটু একটু করে বড়ো হয়ে ওঠা, সেইসব ধারার কোনোটাই তাঁকে তেমন স্বস্তি দিতে পারেনি। পাশ্চাত্য রীতি-প্রকরণে অনায়াস

দক্ষতাও তাঁর শিল্প-মানসকে তেমন তৃপ্তি দেয়নি। ১৯২০ থেকে ১৯২৭—প্রায় সাতটা বছর যামিনী রায় সৃষ্টির দুয়ারে মাথা ঠুকে হয়রান হয়েছেন। তারপর হঠাৎ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো শিল্পীর কাছে খুলে গেল নতুন সৃষ্টির জগৎ। পৌঁছে গেলেন এক সিদ্ধি থেকে অন্যসিদ্ধির গূঢ় পথে কোন এক দৈবাগত দিনে। এরপর তাঁকে আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। শুরু হল শুধুই সামনের দিকে পথ চলা এবং সেটাও প্রায় কম সময় নয়—সময়ের হিসেবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর (১৯২৭ থেকে ১৯৭২)।

বিশ শতকের চল্লিশের দশকের প্রথম দিকের কথা। ছাত্রদের আয়োজিত এক ছাত্র সম্মেলনে শহরের বহু খ্যাতিমান ও কান্তিমান মানুষের সঙ্গে যামিনী রায় একবার এসেছিলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। ছাত্রদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে সেদিন মঞ্চে উঠতে হয়েছিল। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে চুপচাপ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে তিনি ছাত্রদের উদ্দেশে বললেন, 'আমি বক্তা নই, বলতে কিছু পারব না। আমার কাজ শিল্পসৃষ্টির—আমি ছবি আঁকি। একজন শিল্পীর কাজের মধ্যেই থাকে তার প্রতিদিনের জীবন, সুখ-দুঃখের অনুভব, চাওয়া-পাওয়ার কথা। তার চরিত্র, তার জীবনবোধ, তার গভীর মনের নিভৃত ভাবনা এবং সবকিছুই লীন হয়ে থাকে তার সৃষ্টির মধ্যে। আপনারা যদি সত্যি আমার কথা শুনতে চান তবে আসুন আমার বাড়িতে, সেখানে এখন আমার একটা প্রদর্শনী চলছে। আপনারা সবাই আসুন—আমার ছবির মধ্যেই আমার কথা শুনতে পাবেন।"

কখনো তিনি ঠাঁইনাড়া হননি। কখনো তিনি পা রাখেননি দেশের বাইরে। দু-একটি ঘরোয়া আড্ডা ছাড়া নিজের

সাধনভূমি অর্থাৎ সৃষ্টির জায়গা ছেড়ে বাইরে কখনো যেতে চাইতেন না। অথচ সারা পৃথিবীর শিল্প আন্দোলনের ইতিহাস এবং এমনকি সাম্প্রতিক শিল্পচর্চার খুঁটিনাটি বিষয়ও যামিনী রায়ের অজানা থাকেনি। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পচর্চায় মানুষ হিরে ফেলে কাচকে গ্রহণ করল। যামিনী রায়ের মননে ধরা পড়ল সেই ছবি—'সভ্যতার অগ্রসর হলে চাকচিক্যের প্রবল আকর্ষণে সে-শিল্প ভেঙে পড়ল, শৌখিনতার প্রখর আলোয় চোখে লাগল ধাঁধা। শিল্পীর দল কোমর বেঁধে নেমে পড়ল পালিশ করার কাজে, শিল্পের আসল কথা গেল ভুলে। আমাদের দেশে যাকে বলে বিভূতির আকর্ষণে যোগভ্রষ্ট হওয়া অনেকটা সেইরকম। ছবি নিখুঁত হল, ছবিতে পালিশ এল—এত নিখুঁত, এত সংস্কৃত যে কল্পনা করা কষ্টকর। আঁকা আঙুরকে সত্যি আঙুর বলে ভুল করে পাখি পর্যন্ত ক্যানভাস ঠুকরেছে, এত নিখুঁত। যোগশাস্ত্রে বিভূতিদর্শন যেমন নেশা ধরার কথা শোনা যায়, শিল্পের ক্ষেত্রেও তেমনি এই সংস্কার করার নেশাও কম নয়। যতদিন এ নেশা ছিল ততদিন বেশ ছিল। তারপর শিল্পসাধনায় দীর্ঘ-ইতিহাসের পর এতদিনে ইওরোপীয় শিল্পীদের আজ হঠাৎ টনক নড়েছে, নেশা ভেঙেছে। সংস্কৃত করার পথে এর বেশি তো যাওয়া যায় না। এরপর কী? শিল্পী চলবে কোন্ পথে? ওরা দেখলে এখন সব পথই প্রায় রুদ্ধ। অনেকটা দাবা খেলার মতো। যতক্ষণ খেলবার নেশা ছিল ততক্ষণ আলাদা কথা, কিন্তু হঠাৎ এমন জায়গায় এসে পড়েছে যে, পথ আর নেই। যে পথেই যেতে যায় মাৎ হয়ে যায়। এদিকে খ্রিস্টের পুরাণে বিশ্বাসও ক্ষয়ে গেছে এবং আর কোনো পুরাণও খুঁজে পাচ্ছে না। ওরা তাই সমস্ত খেলার ছক লন্ডভন্ড

করে ভাঙতে চায়, যে চাল একদিন দিয়ে এসেছে সে সমস্ত চাল ফিরিয়ে নিতে চায়। আজকের ইওরোপীয় শিল্পে এই ভাঙনের রূপ প্রত্যক্ষ। ওরা যদি গোড়া বেঁধে খেলতে শিখত তাহলে এ অবস্থা নিশ্চয়ই হত না।'

[যামিনী রায়ের প্রবন্ধ 'পটুয়া শিল্প', দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত]

তাঁর বিশেষ ধারা যেমন একদিকে যামিনী রায়কে এনে দিয়েছিল বিশ্বমানের স্বীকৃতি তেমন তাঁর বিরুদ্ধে শিল্পসমালোচকেরা বেশ কিছু অভিযোগও করেন—তাঁরা মনে করেন যামিনী রায় একই ছবি বারে বারে এঁকেছেন এবং তাঁর বেশিরভাগ ছবিই পুরাণকে আশ্রয় করে অর্থাৎ শিল্পসমালোচকেরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্বকে মানতে রাজি ছিলেন না। চারপাশের যে চলমান পৃথিবী সে-বিষয়ে শিল্পীর নীরবতা নিরাসক্তি নিয়ে সমালোচকদের অনুযোগ কম থাকেনি। অবশ্য এই সব প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচনা করা যাবে। তবুও এই সব অভিযোগ-অনুযোগ থাকা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বেছে নিয়েছিলেন শিল্পী যামিনী রায়কেই শিল্পকলা সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধির কথা বলার জন্য—'শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় কল্যাণবরেষু, ... যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্ব-দৃশ্যে গানের সুর লাগত কানে, ভাবের রস আসত মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টান্‌লো তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেল। গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগল। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগল যা প্রকাশ হয়ে উঠ্‌ছে। এছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত দ্রষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করলো।

এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখবার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি—যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে। কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু তাঁরা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন বলে আমার বোধ হয়নি। সেই জন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম—তুমি গুণী, তুমি এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না—দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না; ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে 'অয়ম্ অহম্ ভো'—এই যে আমি।'

নতুন ধারার সৃষ্টিশীলতা যামিনী রায় আয়ত্ত করেছিলেন অবশ্য কলকাতায় বাস করেই। তাঁর মনে হয়েছিল প্রতিটি সৃষ্টিশীল সংস্কৃতিমনা মানুষের কলকাতা বাস একান্ত প্রয়োজন। কেননা কলকাতার জলহাওয়া সৃষ্টিশীল মানুষের অনুকূলে থাকে। প্রয়োজনে একবেলা খেয়েও এই শহরের নিশ্বাস নেওয়া দরকার। কলকাতায় জীবনের প্রায় সত্তরটা বছর কাটালেও যামিনী রায় কিন্তু আজীবন ভুলতে পারেননি তাঁর বেলেতোড়ের গ্রামীণ পরিমণ্ডল—গ্রামের আটচালায় কীর্তনিয়াদের গানবাজনা—গ্রামের মাঠে- ঘাটে-জঙ্গলে কৃষক রাখাল বালক বাউল বোষ্টম (বৈষ্ণব) ফকিরের আনাগোনা—মন্দিরে মন্দিরে গ্রামের মেয়ে-বউদের পরিক্রমা—রাস-দোল- দুর্গোৎসবে সাধারণ মানুষের

মাতামাতি—সাঁওতাল মেয়ে-পুরুষদের (ভূমিপুত্র কন্যাদের) প্রকৃতি প্রীতি—এ সমস্তই যামিনী রায়ের শিল্প- নস্টালজিয়ায় অনবরত দেখা দিয়েছে রোমান্টিক মানসিকতার ফসল হিসেবে। সম্ভবত 'যামিনী রায় প্রথম আধুনিক ভারতীয় শিল্পী যিনি একান্ত ভারতীয় চিত্রভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন, যে ভাষা নিমেষে ভারতীয়, তথা বাঙালির বলে ধরতে ভুল হয়না। বোধহয় কিছুটা সেইজন্যই শুদ্ধ চিত্র আঁকতে গিয়ে তিনি আধুনিক জীবনের বিশেষ বিশেষ প্রকাশকে অস্বীকার করেন। স্পষ্টই ঘোষণা করেন, এই ছেঁড়াখোঁড়া, কিম্ভূতকিমাকার, রূপ ও ডিজাইন বর্জিত সমাজ ও রাষ্ট্রকে তিনি মানেন না। তিনি তাঁর নীতি অবিচলিতভাবে ধরে থাকার সাহসও রাখেন। যে বাংলা দেশ চলে গেছে, যে জীবন আর ফিরবে না, সে জীবনকে সত্য বলে মানতে তাঁর দ্বিধা নেই" [অশোক মিত্র]

যামিনী রায়ের ছবি আমাদের প্রাচ্যদর্শন ও প্রাচ্যসভ্যতার কথা মনে করিয়ে দেয়। তার উদাত্ত নির্মল ভাব ও বিস্তৃত প্রশান্তি আমাদেরকে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে দেয়। তাঁর ছবির সামনে এসে দাঁড়ালে আমরা সমস্ত নেতিবাচকতা ভুলে যাই—মনে এমনকি দেহে এসে উপস্থিত হয় এমনভাব—যে ভাব নানা বিপর্যয়সঙ্কুল দেশশাসনের রাজসিক ভাব নয়, সে ভাব চিন্তা ও কর্মশোধিত সাত্ত্বিক ভাব।

।। শৈশবের দিনগুলি ।।

সদর শহর বাঁকুড়া থেকে কুড়ি-বাইশ কিলোমিটার দূরে বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে (চলতি কথায় বেলেতোড়) ১৫ এপ্রিল ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে যামিনী রায়ের জন্ম হয়। তাঁর পুরো নাম ছিল যামিনীরঞ্জন রায়। তাঁর বাবা রামতারণ রায় একসময় কিছুদিনের জন্য সরকারি চাকরি করেন। পরবর্তীকালে নিজের ইচ্ছায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে এসে চাষবাস শুরু করেন। নিজের আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে যামিনী রায় বলেছেন, 'আমি গ্রামের মানুষ। তখনও গ্রামে শহরের অস্বাভাবিক জীবন দাগ রাখেনি। বাবা কিছুদিন সরকারি চাকুরিতে ছিলেন। চাকুরি তিনি ছেড়ে দিলেন, গ্রামে ফিরে এসে চাষির জীবন আরম্ভ করলেন। আমাদের গোটা পরিবার আত্মীয়স্বজন জাতে ও অবস্থায় সমাজের ওপরতলারই মানুষ ছিলেন। গ্রামে দুটি গোষ্ঠী ওইরকম ছিল। মায়ের পরিবার বেশ স্বচ্ছল ছিল। কিন্তু তবু তিনি আমার বাবার স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া সরল গ্রামীণ জীবনের সহায় ছিলেন। বাবা তুলোর চাষ করতেন, তাতে সুতো করতেন, গ্রামের তাঁতিদের দিয়ে আমাদের জন্য ধুতি শাড়ি করাতেন, তারা লাল পাড়টা করতে পারত না, স্বামীর জীবিত অবস্থায় মেয়েদের তো পাড় রাখতে হয়, মা-কেই লাল সুতো দিয়ে সরু পাড়ের একটা কিছু করতে হত ওই মোটা কাপড়ে (সধবা মানুষ তো!) সরষে চাষ থেকে সরষের তেল, মাথায় মাখার জন্য তিল তেল। বাবার স্থির

বিশ্বাস ছিল, প্রকৃতির নিয়মে জল-হাওয়ায় অঞ্চলের মাটিতে যা ফলে তাই সে অঞ্চলের মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি নিজে গোরু ছাগল ভেড়া মোষ রাখতেন। তখন গ্রামের কাছে বেশ বড়ো জীয়ন্ত বনজঙ্গল ছিল, সে বনে বেশ জন্তুও ছিল। তাই তিনি গোরু ছাগল মোষের ছাউনি ঢাকা আশ্রয়ে বা গোশালায় রাত্রে নিজেই শুতেন। বাবা চাষিদের বাউরিদের পছন্দ করতেন। পেনসিলের বদলে নখ দিয়েই কাগজে ড্রয়িং শেখান। বংশের গর্বও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু মাকে ক্ষেতখামারে নিজেকেই খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হত। আমাদের অনেক বাউরি ছিল, কাজ করত। বাবা বলতেন, আমাদের সকলের এক হাতে যেন বই, অন্য হাতে লাঙল।'

[যামিনী রায়—বিষ্ণু দে]

যামিনী রায়ের জন্মতারিখ ও সাল নিয়ে একটি মিথ্যে বিতর্ক আছে। 'ভারতের ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী' নামক বইটিতে লেখক কমল সরকারের মতে, '১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে জন্ম।' একবার যামিনী রায়ের শিল্প প্রদর্শনীর উল্লেখে 'স্টেটসম্যান' লেখে, 'বর্ন ইন ১৮৮৯ অ্যাট বেলিয়াতোড় ইন দ্য ডিস্ট্রিক্ট অব ব্যাঙ্কুরা'। অন্য একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের রবিবাসরীয় সংখ্যায় (১৫.০৩.১৯৮৭) শিল্পীর জন্মতারিখ ১০ এপ্রিল, ১৮৮৮ বলে উল্লেখ করে। বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত আধুনিক কবি বিষ্ণু দে তাঁর 'যামিনী রায় : তাঁর শিল্পচিন্তা ও শিল্পকর্ম বিষয়ে কয়েকটি দিক' শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, 'যামিনী রায়ের জন্ম ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে, শুনেছিলাম এপ্রিলের মাঝামাঝি, বাংলা বছরের শেষ রাত্রিতে।' বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক প্রশান্ত দাঁ-র

মতে, 'যামিনী রায়ের বাড়িতে কথা বলে জানলুম ১৮৮৭-ই ঠিক। এবং দিনটা হল বাংলা বছরের প্রথম দিন অর্থাৎ ১ বৈশাখ। এ বিষয়ে শিল্পীর চতুর্থ পুত্র অমিয় রায় বলতেন, 'চৈত্র মাসের শেষ তারিখে রাত্রি বারোটার পর তাঁর জন্ম হয়েছিল। তাই ১ বৈশাখ নববর্ষের দিন তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়।' তাঁর কথাতেই জানা যায় জীবনের শেষ দিকে শিল্পীর এক অদ্ভুত অভ্যেস ছিল। যেখানে ছবি আঁকতে বসতেন সেখানে খুচরো পয়সা দিয়ে নিজের জন্মসালটা সাজিয়ে রাখতেন। সাজাতেন '১৮৮৭' সংখ্যাটি। দিল্লির ললিতকলা অ্যাকাডেমির 'Lalitkala Series of Contemporary Indian Art' পর্যায়ের যামিনী রায় সংখ্যায় ১৮৮৭ সালটিকেই তাঁর জন্মসাল বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যামিনী রায়ের মা নগেন্দ্রবালা দেবীর কাছে তাঁর মেজো ছেলে যেন একটু বেশিই প্রশ্রয় পেতেন। ষোলো বছর বয়স পর্যন্ত যামিনী রায় বেলিয়াতোড় গ্রামেই ছিলেন বাবা-মা-এর নিকট সান্নিধ্যে।

বংশ মর্যাদার দিক থেকে যামিনী রায়ের এক আলোকোজ্জ্বল অধ্যায় আছে। বেলিয়াতোড়ের রায়-পরিবার ছিলেন যশোহররাজ প্রতাপাদিত্য রায়ের বংশধর। সুবলচন্দ্র মিত্রের সুবৃহৎ সরল বাঙ্গালা অভিধান গ্রন্থের ৮৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যের নাম বসন্ত রায়। প্রতাপাদিত্য তাঁর শিরশ্ছেদন করায় বসন্ত রায়ের পুত্র কচু রায় গোপনে দিল্লিশ্বর জাহাঙ্গিরের শরণাপন্ন হন এবং দিল্লিশ্বরের আদেশে কচু রায়ের সঙ্গে মানসিংহ সসৈন্যে বাংলায় এসে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে

প্রথমবার প্রতাপাদিত্য জয়ী হলেও দ্বিতীয়বারের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দিদশায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অন্যদিকে কচু রায় ভাগ্যান্বেষণে বিষ্ণুপুরে আসেন ও মল্লরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং বুদ্ধিমত্তার জোরে বিষ্ণুপুররাজের দেওয়ান পদ লাভ করেন। বিষ্ণুপুরের গোপালগঞ্জে তিনি দশভুজা দুর্গার মন্দির নির্মাণ করেন। রাজসভার কাছাকাছি বিষ্ণুপুররাজ কচু রায়কে উচ্চ বংশ শোভন জায়গির দিতে চাইলে তিনি তাতে রাজি হননি। রাজারাজড়ার দরবারি অভিজ্ঞতার পর কচু রায় একটু শান্তিপূর্ণ জীবন চেয়েছিলেন। তাই তিনি রাজধানী থেকে দূরে জঙ্গলে ঘেরা এক প্রত্যন্ত এলাকা বেলিয়াতোড়ে রাজ অনুমতি নিয়ে জায়গির গ্রহণ করে বসতি স্থাপন করেন। এখানেও দেবী দুর্গার পুজো শুরু করেন। তবে পারিবারিক দেবী দুর্গার বিগ্রহ বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত থাকায় বেলিয়াতোড়ে দেবী প্রতিমার পূর্ণাবয়ব মূর্তি নির্মাণের পরিবর্তে দেবীর মুখমণ্ডলমাত্র নির্মাণ করে পুজো করেন। সেই পুজো এখনও হয়ে আসছে।

আজকের বেলিয়াতোড়কে দেখলে আজ থেকে দেড়শো বছর আগের বেলিয়াতোড় সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যাবে না। বেলিয়াতোড় গ্রাম ঘিরে এবং ওই পথ দিয়ে যত দূরেই যাওয়া যেত—চারিদিকে শুধু ঘন জঙ্গল, সেই সময়ে আর একটু এগিয়ে গেলেই দুর্গাপুরের জঙ্গলে বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতা ভবানী পাঠকের গোপন ডেরা। তবে এখনও বেলিয়াতোড় থেকে খাড়ারি, সাহারজোড়া হয়ে বড়জোড়া, ঘুটগড়িয়া, মালিয়াড়া, গঙ্গাজলঘাটি পর্যন্ত সুবিশাল এলাকায় কোথাও গভীর, কোথাও অগভীর জঙ্গল

রয়েছে। তবে সেখানে এখন ভবানী পাঠকের মতো মানুষের আড্ডা না থাকলেও হাতির অভাব নেই। প্রতি বছর দলমা পাহাড় থেকে নেমে আসা হাতির দল বেশ কয়েকমাস এই অঞ্চল দাপিয়ে বেড়ায়। ফলে ফসল ও বাসস্থানের অনেক ক্ষতি হয়। প্রায় প্রতি বছরই বেশ কিছু মানুষের প্রাণনাশ হয়।

বেলিয়াতোড়েই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সহায়তায় ও আনুকূল্যে রায়-মহাশয়দের জমিদারির পত্তন হয়। 'বাঁকুড়া জনের ইতিহাস-সংস্কৃতি' গ্রন্থের বিশিষ্ট গবেষক শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরীর ভাবনায় '...বেলিয়াতোড়ের কায়স্থ 'রায়' পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা সতত্ত্বরাম রায়।' পেশায় দেওয়ান হয়ে তিনি ছিলেন 'ক্রোড়ী' অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায়কারী। প্রকৃতপক্ষে ক্রোড়ী ছিলেন আড়াই লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায়কারী। এ পরিবারের মূল পদবি 'গুহ'।

যামিনী রায়ের ছেলেবেলায় জঙ্গল ছিল বেলিয়াতোড় গ্রামের সীমানাতেই। গোয়ালঘরে গবাদি পশুগুলির নিরাপত্তার জন্য রামতারণ তাঁর মেজো ছেলে যামিনীকে নিয়ে গোয়ালঘরের লাগোয়া একটি বাড়িতে (বারান্দায় সম্ভবত) রাত্রে বাস করতেন। বালক যামিনী ভয়ে কাঁদতে থাকলে বাবা তাকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন—'এই দেখো আমার পাশে দা (অস্ত্র) রয়েছে, তোমাকে কোনো জন্তুই আক্রমণ করতে পারবে না।'

যামিনী রায়ের মামাবাড়িও ছিল বেলিয়াতোড়ের নিয়োগী পাড়ায়। জন্মেছেন মামাবাড়ির ঢেঁকিশালাতে। তখনকার দিনে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ছেলেমেয়ের জন্ম হত বাড়িতে কিম্বা